পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ

নাজমুন নাহার প্রমা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশটির অভিজ্ঞতা কম নয়। সাবেক পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১ সালের কলম্বো পরিকল্পনার আওতায় পাকিস্তানে সর্বপ্রথম একটি ৬ষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-১৯৫৭) গৃহীত হয়।

কিন্তু এর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯৫৫ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করা হয় । এরপর ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় ।

কিন্তু এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ঘটলেও পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে এবং একসময় তা এক অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়।

এর ফলশ্রুতিতে এদেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় এবং তার পরিণতিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে ।

আর্থ-সামাজিক শোষণ বঞ্চনা আর বণ্টন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার বাঙালির ঐতিহাসিক মুক্তির সংগ্রাম দীর্ঘদিনের পথপরিক্রমায় ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে চূড়ান্ত বিজয়ে বিভূষিত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি সাধন ছিল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা।
বাংলাদেশের সংবিধানেও গণমানুষের উন্নত জীবনযাত্রার স্বপ্ন পূরণের নিশ্চয়তা স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ১৫ ধারায় রাষ্ট্রকে উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা উন্নততর জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের এই দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশেই বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের ভিত্তি রচিত হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে প্রাদেশিক পরিকল্পনা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও একটি ক্ষুদ্রকায় পরিকল্পনা সেল তৈরি করে। সে সময় প্লানিং সেলের কাজ ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পুনর্বাসন পুনর্গঠন কাজে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তার কর্মকাঠামো ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই নতুন সরকারের প্রথম ও প্রধান একটি পদক্ষেপ ছিল ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং এর ডেপুটি চেয়ারপারসন ও সদস্যদের নিয়োগদান। সে সময়ে মন্ত্রিপরিষদে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : (১) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন রূপকল্প নির্মাণ। (২) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান ও কার্যবিধি সংরক্ষণে সুপারিশদান এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হওয়া। (৩) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে গৃহীতব্য উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ বা ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের (এনইসি) পক্ষে উন্নয়ন ও নীতিনির্দেশনা পরীক্ষা পর্যালোচনার কাজও পরিকল্পনা কমিশনের। এনইসিকে একটি মিনি মন্ত্রিপরিষদ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়, মন্ত্রিপরিষদের

অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিষয়ক মন্ত্রীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এনইসি গঠিত হয়। একই সঙ্গে এনইসির নির্বাহী কমিটি সংক্ষেপে একনেকের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয় এভাবে- (ক) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বিবেচনান্তে অনুমোদন, (খ) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং (গ) অর্থনীতির সার্বিক অগ্রগতি এবং তদসংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা, তথা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের কাছে সুপারিশ রাখা। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য। এরপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তে একটি অন্তর্বর্তীকালীন দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (১৯৭৮-৮০) কাজ হাতে নেয়া হয়। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় ২ বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৭-২০০২ সময়ের জন্য। ২০০৩-২০১১ সালের জন্য সরকার ষষ্ঠবার্ষিক পরিকল্পনার স্থলে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (অন্তর্বর্তীকালীন ও পূর্ণাঙ্গ) প্রণয়ন করে। ২০১১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) মঙ্গলবার (২৯ ডিসেম্বর) দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। যা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

এক নজরে বাংলাদেশে এযাবৎকালে গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহ-

(১) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)
(২) দ্বি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০)
(৩) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)
(৪) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-১৯৯০)
(৫) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫)
(৬) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)
(৭) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)
(৮) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০)
(৯) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)

দারিদ্র বিমোচন , অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই এ পরিকল্পনাগুলো প্রণীত হয় । বিদেশি সাহায্য নির্ভর এ পরিকল্পনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

তবুও বলা যায় , বাংলাদেশের এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে।

ধীরে ও অল্পহারে হলেও এদেশে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে । অর্থনীতির কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তন তেমন না ঘটলেও সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় ১৯৭৩ সালে । এ পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ।

ক. পরিকল্পনার আয়তন ও অর্থসংস্থান

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪,৪৫৫ কোটি টাকা । মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯ % অর্থৎ ৩,৯৫২ কোটি টাকা সরকারি খাতে এবং ১১ % অর্থাৎ ৫০৩ কোটি টাকা বেসরকারি খাতে ব্যয় ধরা হয় । কাজেই এ পরিকল্পনার সরকারি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । পরিকল্পনার

মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ২.৬৯৮ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ১,৭৫৭ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে আসবে বলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ পরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৬০ ভাগ অভ্যন্তরীণ ও শতকরা ৪০ ভাগ বৈদেশিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। গণতন্ত্র , সমাজতন্ত্র , ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ , রাষ্ট্রীয় এ চার মূলনীতি , দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হতে মুক্তি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়ের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো নির্ধারিত হয়

১। জনগণের দারিদ্র্য লাঘব করা।

২। পুনর্গঠন কাজ অব্যাহত রেখে তা সমাপ্ত করা এবং অর্থনীতির প্রধান খাত কৃষি ও শিল্পের অবস্থা দ্রুত ১৯৬৯-৭০ সালের সময়ের পর্যায়ে উন্নীত করা।

৩। মোট জাতীয় উৎপাদন (GDP) গড়ে বার্ষিক ৫.৫ % হারে বাড়ানো।

৪। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য , যেমন খাদ্য , বস্ত্র , ভোজ্য তেল , কেরোসিন , চিনি ইত্যাদি উৎপাদন বাড়ানো।

৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধ করে স্থিতিশীল করা।

৬। মাথাপিছু আয় গড়পড়তা বার্ষিক ২.৫ % হারে বাড়বে।

৭। ৪১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৮। দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে পরিকল্পনাকালে সেগুলোকে আরও সুসংহত করা।

৯। জনসংখ্যা বাড়ার হার রোধ করা। এজন্য পরিবার পরিকল্পনার কার্যকারিতা বাড়ানো এবং জন্মহার ৩ % থেকে বার্ষিক ২.৮ % এ নামিয়ে আনা।

দ্বি – বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পরে স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু তা না করে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ এ দু বছরের জন্য একটি দ্বি - বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় প্রথম পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্প গুলো শেষ করা , প্রথম পরিকল্পনার ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা , বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাবনা যাচাই প্রভৃতির জন্য ২ বছর মেয়াদী একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল।

ক. পরিকল্পনার আয়তন ও অর্থসংস্থান

দ্বি - বার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩.৮৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ব্যয় বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩,২৬১ কোটি টাকা ও ৬০০ কোটি। অর্থাৎ , মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে সরকারি খাতের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৮৩ ভাগ এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ শতকরা ১৭ ভাগ। পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎসের অবদান ধরা হয় ১,৩০৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য ২,২৯৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ , পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ দেশীয় সম্পদ হতে এবং শতকরা ৬৪ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে বলে ধরা হয়। অবশিষ্ট যে ২৬১ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা দেবে তা দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ ও অতিরিক্ত বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে পূরণ করার কথা ছিল।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ

দ্বি – বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য গুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১। উন্নয়নের হার বাড়ানো।
২। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানো।
৩। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমানো
৪। আয়ের সুষম বন্টন
৫। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা
৬। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন
৭। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও উপকরণের যোগান বানানো প্রভৃতি।

গ. পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

দ্বি – বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিলঃ

১। প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক ৫.৬ % হারে এবং বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২.৪ % হারে বাড়ানো।
২। কৃষি - উৎপাদন বার্ষিক ৪.১ % হারে বাড়ানো।
৩। শিল্পোন্নয়নের হার বার্ষিক ৭.৩ % হারে বাড়ানো।
৪। বার্ষিক গড় সঞ্চয়ের হার মোট উৎপাদনের ২.৬ % ভাগ থেকে পরিকল্পনা শেষে ৫.৭ % ভাগে উন্নীত করা।
৫। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা প্রথম পরিকল্পনার শেষ বছরের শতকরা ৭৭ ভাগ থেকে কমিয়ে দ্বি - বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে শতকরা ৬৪ ভাগ আনয়ন করা হয়।
৬। রপ্তানি আয় বার্ষিক শতকরা ১১ ভাগ হারে বাড়ানো।
৭। পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ২৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৮। পরিকল্পনার শেষ বছরে (১৯৭৯-৮০) খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১৪৪ লক্ষ মেঃ টন উন্নীত করা। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি বছরে ১৭ লক্ষ মেঃটন থেকে ১৩ লক্ষ মেঃ টন কমিয়ে আনা।
৯। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সম্প্রসারণের হার শতকরা ১৬ ভাগ বাড়ান।
১০। পরিকল্পনা আমনে অতিরিক্ত ৫০০ গ্রামে বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
১১। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের সুযোগ বাড়ান। অতিরিক্ত ১৫০০ হাসপাতাল বিছানা এবং অতিরিক্ত ১৮০ টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)

দ্বি – বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর ১৯৮০ সালের জুলাই মাস থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। পরিকল্পনার আয়তন ছিল ২৫,৫৯৫ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ২০,২১৫ কোটি টাকা ও ৫,৪৭৫ কোটি টাকা। কিন্তু দেশে আর্থিক সম্পদ সংস্থানের হার আশানুরূপ হওয়ায় এবং বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমে যাওয়ায় পরবর্তীকালে পরিকল্পনার আয়তন ও ব্যয় বরাদ্দ পুনঃনির্ধারিত হয়।

ক. সংশোধিত পরিকল্পনা আয়তন

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় পঞ্চ – বার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত পরিকল্পনার মোট ব্যয় ১৭,২০০ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি খাতে ১১,১০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ৬,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে দেশীয় সম্পদ থেকে ৯,৫০০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ বাবদ ৭,৭০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়। পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার হার ছিল শতকরা ৫৮ ভাগ।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

সংশোধিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলোর পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করা।

২। গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩। শ্রমশক্তি উন্নয়ন ও শ্রমের যোগানের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের সুযাোগ বাড়ানাো।

৪। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উল্লেখযোগ্যভাবে জনসম্পদের উন্নতি সাধন।

৫। মাোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক শতকরা ৫.৪ ভাগ হারে বাড়ানাো।

৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২.৮০ হতে ২.২৩ - এ।

৭। অধিক হারে স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

৮। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আয়, সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টন সাধন করা।

৯। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১.৭৫ কোটি মেঃ টন।

১০। মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে বাড়ানাো।

১১। কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা ৫০ ভাগ এবং শিল্প খাতে বার্ষিক শতকরা ৮.৪ ভাগ ধরা হয়।

১২। ১৯৮০-৮৫ সাল নাগাদ জাতীয় সঞ্চয় মাোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৭.১৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হয়।

গ. পরিকল্পনায় খাতওয়ারি ব্যয় বরাদ্দ

দ্বিতীয় পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এ ব্যয় বরাদ্দ (৬,০৫৯ কোটি টাকা) মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ। এরপর শিল্পখাতে বরাদ্দ করা হয় ৩০৬৯ কোটি টাকা যা ছিল পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ। পরিবহন ও যাোগাযাোগ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ২৫১০ কোটি টাকা যা ছিল মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১৫ ভাগ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ কাল ছিল ১৯৮৫ সালের ১ লা জুলাই থেকে ১৯৯০ সালের ৩০ শে জুন। এ পরিকল্পনার আয়তন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ, খাতওয়ারী বরাদ্দ ও মূল্যায়ন নিচে আলোচনা করা হলঃ

ক. পরিকল্পনার আয়তন

তৃতীয় পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনার মোট ৩৮,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ২৫,০০০ কোটি টাকা বা ৬৫ % সরকারি খাতে এবং ১৩,৬০০ কোটি টাকা বা ৩৫ % বেসরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয়। মোট ব্যয়ের মধ্যে ১৭,৫৭২ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে সরকারি সঞ্চয় ৫,৯৬০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি সঞ্চয় ১১,৬১২ কোটি টাকা এবং ২১,০২৮ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য থেকে সংগ্রহ করা হবে বলে ধরা হয়। এ পরিকল্পনায় বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভশীলতার হার ধরা হয় ৫৪.৫ শতাংশ।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিচে উল্লেখ করা হলঃ

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ।

২। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ

৩। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
৪। অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের নিমিত্তে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন।
৫। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
৬। সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিম্নতম মৌলিক চাহিদা পূরণ।
৭। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণ এবং
৮। অধিকতর স্বনির্ভরতা অর্জন।
উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্য গুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনার নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ঃ
১। পরিকল্পনার মেয়াদকালে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধিও হার নির্ধারণ করা হয় ৫.৪ শতাংশ।
২। ১৯৮৯-৯০ সালে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার কৃষি হাতে ৪ % , শিল্প খাতে ১০.১ % , বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে ৯.৬ % নির্মাণ খাতে ৪.৯ % পরিবহন খাতে ৬.৯ % এবং অন্যান্য খাতে ৫.৮ % অর্জিত হবে বলে আশা করা হয়।
৩। ১৯৮৯-৯০ সালে ২.০৭ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।
৪। পরিকল্পনাকালে ৫১ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পরিকল্পনা শেষে মোট ২৪৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে আমা করা হয়।
৫। ১৯৯০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে বলে অনুমান করা হয়।
৬। পরিকল্পনা শেষে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত করার আশা ব্যক্ত করা হয়।
৭। পরিকল্পনা শেষ বছরে জাতীয় আয়ে করের অংশ ১০.৩ % হবে বলে ধারণা করা হয়।
৮। পরিকল্পনা মেয়াদ রপ্তানির পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৫.৯ ভাগ হারে বাড়বে বলে ধরা হয়।

গ. পরিকল্পনার খাতওয়ারী বরাদ্দ

তৃতীয় পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে যথাক্রমে ২৫,০০০ কোটি এবং ১৩,৬০০ কোটি মাোট ৩৮,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাতওয়ারি ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনা করতে গিয়ে বলা যায় , কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ ১১,৪৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় যা ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। বেশি ব্যয় বরাদ্দের অন্যান্য খাতের অবস্থা ছিল শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় ১৬ % ভাগ , শিল্প ও খনিজ প্রায় ১৫ % ভাগ পরিবহন ও যাোগাযাোগ প্রায় ১২ % ভাগ , ভৌত পরিকল্পনা , গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ প্রায় ১১ % ভাগ।

ঘ. পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য খাত গুলোর উন্নয়ন কৌশল

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সাফল্য কেবল আর্থিক বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে না , বরং সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা , সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতি ও সঠিক কৌশল প্রভৃতির ওপর তা নির্ভরশীল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে উন্নয়ন নির্ধারিত হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপঃ

১। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনঃ পরিকল্পনা শেষে ১৯৮৯-৯০ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২০৭ লক্ষ মেঃ টন। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য নির্ধারিত কৌশল ছিল আধুনিক সেব সার বীজ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি , বাোরাো ও গম উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান এবং শীতকালীন চাষের জন্য পানি বর্ধিত ব্যবহার।

২। অপ্রধান শস্যের উৎপাদনঃ গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বাড়ানাোর জন্য সীমিত জমি ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের কথা বলা হয়। কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য একটি সুষ্ঠু শস্য উৎপাদন নীতি গ্রহণ করা হয়।

৩। পাট উৎপাদনঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় পাটের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য উন্নত বীজ সরবরাহ করার কথা বলা হয়। পাটের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের কৌশল গৃহীত হয়।

৪। গবাদি পশু ও মৎস্য উন্নয়নঃ পরিকল্পনাকালে গবাদি পশু সম্পদ বাড়ানোর জন্য পশুপালন খামারের উন্নয়ন, পশু প্রজনন, চিকিৎসা ও পশু খাদ্য সরবরাহে উন্নতি সাধন করা হবে বলে ধরা হয়। বলা হয় এতে ভূমিহীন কৃষকদের কর্মযোগ বাড়বে। গ্রামীণ পুকুরে মৎস্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করার কৌশল গৃহীত হয়।

৫। বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ তফসিলঃ পরিকল্পনা শিল্প খাতে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিল্প বিনিয়োগ তফসিলকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত ও নমনীয় করা হয়। ছোট শিল্পগুলোকে বড় ও মাঝারি প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার যথাযথ নীতি গৃহীত হয়।

৬। জ্বালানি সম্পদের উন্নয়নঃ গ্যাসের উত্তোলন ও বন্টন প্রক্রিয়া এবং দেশের পশ্চিমাংশে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার কথা বলা হয়। এ খাতে অন্যান্য কৌশল ছিল- গ্রামাঞ্চলে পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি, মুক্ত বন উন্নয়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস কমান এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে বিদেশী কোম্পানিকে আকৃষ্ট করা।

৭। পরিবহন ও যোগাযোগঃ পরিবহন খাতের উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ভৌত সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৮। শিক্ষাঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষা উন্নয়নের জন্য স্থিরীকৃত কৌশলগুলো ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের উপর অর্পণ, প্রাথমিক স্তরে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও মাঝপথে স্কুল ত্যাগের হার কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ, ছোট ছোট এলাকায় স্কুল স্থাপন, শিক্ষা উন্নয়নের সমাজের গোষ্ঠীগত সংশ্লিষ্টতা অর্জন প্রভৃতি।

৯। স্বাস্থ্যঃ ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধার প্রসার এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য - বিজ্ঞান ও পুষ্টি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়।

১০। জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনাঃ পরিবার পরিকল্পনার বর্ধিত সাফল্যের জন্য মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সমাজ সচেনতা বাড়ান অপরিহার্য। সেজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাকে শুধু বিবাহিত সম্পদের সমস্যা হিসেবে না দেখে এতে কমিউনিটির অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়।

১১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজনীয় সমাবেশ ঘটানোর জন্য কিছু কৌশল গৃহীত হয়। এগুলো ছিল জাতীয় সম্পদের দক্ষ ব্যবহার দ্বারা সরকারি ভোগ কমানো, ভর্তুকি কমানো, কর প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ান এবং কর - কাঠামো যুক্তিসঙ্গত করা, সরকারি উপযোগ এবং সরকারি খাতের দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়ান প্রভৃতি।

১২। কর্মসংস্থানঃ নিয়োগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার গৃহীত কৌশল গুলো ছিল কৃষির পাশাপাশি কুটির শিল্পে কারিগরি উন্নতির মাধ্যমে শ্রম নিয়োগ বাড়ান, মৎস্য, হাঁস মুরগি ও পশু পালন, বন ও গ্রামীণ শিল্প প্রভৃতি খাতের উন্নয়ন ইত্যাদি। এছাড়া কৃষি বহির্ভূত খাতে কর্ম সুযোগ বাড়ানোর জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপরও জোর দেয়া হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল ১৯৯০ সালের ৩০ শে জুন শেষ হয় । মূলত কাঠামোগত ত্রুটির জন্য এ পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জিত হয়নি । তাই অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৯০-২০১০ সাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় । এ বিশ সাল প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় । ১৯৯০ সালের ১ লা জুলাই থেকে এ পরিকল্পনা শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালের ৩০ শে জুন এর মেয়াদ শেষ হয় ।

ক. পরিকল্পনার আয়তন ও অর্থসংস্থান

চতুর্থ পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনার সংশোধিত পর্যায়ে আয়তন নির্ধারণ করা হয় ৬২,০০০ কোটি টাকা , এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪,৭০০ ও ২৭,৩০০ কোটি টাকা । সংশোধিত মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ৩৪,৫৫০ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ২৭,৪৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য থেকে সংগৃহীত হবে বলে ধরা হয় । পরিকল্পনার প্রাক্কলিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার হার ছিল শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ ।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

দেশের বিশসালা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (১৯৯০-২০১০) এর সাথে সঙ্গতি রেখে চতুর্থ পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনার প্রণীত হয় । এ পরিকল্পনার উদ্দেশগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো ।
২। ক্রমবর্ধমান দারিদ্রায়ন রোধ এবং জনসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা ।
৩। দেশজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান বাড়ান ।
৪। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা ।
৫। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ।
৬। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটান ।
৭। শিল্প খাতকে রপ্তানিমুখী করে তোলা ।
৮। দেশীয় প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর পরিবর্তন আনয়ন ।
৯। দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ ।
১০। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্য সমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা ।
১১। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে খাল খনন , বনায়ন , শাকসবজি ও ফলমূল চাষ ও হাঁস মুরগির খামার , মৌমাছি চাষ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য গুলো বাস্তবায়নের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় তা ছিল নিম্নরূপঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খাত ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা-

খাত	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)
১. মোট দেশজ উৎপাদন	৫.০০
২. কৃষি	৩.৪২
৩. শিল্প	৯.০২
৪. বিদ্যুৎ, গ্যাস, প্রাকৃতিক সম্পদ	৯.২৮
৫. নির্মাণ	৫.৮৬
৬. যোগাযোগ ও পরিবহন	৫.৩৯
৭. বাণিজ্য এবং অন্যান্য সেবা	৫.০০
৮. গৃহায়ণ	৩.৬২
৯. সরকারি সেবা	১০.৫৬

ঘ. পরিকল্পনার খাতওয়ারী বরাদ্দ

দেশের আর্থ - সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই এর খাতওয়ারি ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনায় যেসব খাতে বেশি ব্যয় বরাদ্দ করা হয় সেগুলো ছিল কৃষি , পানিসম্পদ ও গ্রামোন্নয়ন প্রায় ২৭ % ভাগ , পরিবহন ও যাোগাযাোগ প্রায় ১৫ % ভাগ , শিল্প প্রায় ১৩ % ভাগ , বিদ্যুৎ , তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় ১২ % ভাগ , ভৌত পরিকল্পনা , গৃহনির্মাণ ও পানি সরবরাহ প্রায় ১১ % ভাগ।

ঙ. পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উন্নয়ন কৌশল

মানব সম্পদ উন্নয়ন , দারিদ্র মোচন এবং দেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান করা , অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও পতিবন্ধকগুলাে দূর করা , অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়ানাে ইত্যাদি ছিল চতুর্থ পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

- **খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে গোষ্ঠীভিত্তিক পরিকল্পনা সমন্বয় সাধনঃ** পরিকল্পনা নির্মাণের কলাকৌশল দিক থেকে চতুর্থ পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক খাত ও সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নেয়া হয়। দেশের আর্থ - সামাজিক ব্যবস্থাকে পল্লী ও শহর এলাকায় ভাগ করা হয়।

  পল্লী এলাকার কর্মকান্ডকে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত অন্যান্য কর্মকান্ড ভাগ করা হয়। দ্বিতীয়ত কাজে লিপ্ত জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শহর এলাকার সকলে অবশ্যই কৃষি - বহির্ভূত কর্মকান্ডে লিপ্ত বলে ধরা হয়। শহর এলাকায় যারা দরিদ্র , তারা অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দেশের জনসাধারণকে এভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে ভাগ করার ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার তা ঠিক করা যাবে বলে মনে করা হয় এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের ফলে কোন গোষ্ঠী উপকৃত হবে তা নির্ধারণ করা যাবে বলে মনে করা হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৭-২০০২ সাল। ১৯৯৩ সালে বিএনপি সরকারের সময় পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

ক. পরিকল্পনার আয়তন

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়। আর জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয় সাত শতাংশ। সংশ্লিষ্ট সময়ে মাত্র ১ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৭০ শতাংশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলনের চেয়ে অনেক কম মাত্র পাঁচ দশমিক ২১ শতাংশ হয়।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ :

১। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

২। মোট দেশজ উৎপাদন গড়ে বার্ষিক ৭ % হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৩। মাথাপিছু আয় গড়ে বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা ।

৪। শ্রমঘন ও পুঁজিঘন প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

৫। স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং তাদের সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা ।

৬। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং অধিক মূল্য সংযোগকারী রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কর ।

৭। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বিশেষ করে বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা খাতের উন্নয়ন সাধন করা ।

৮। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করে ।

৯। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা ও জন্ম নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করে পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে ১.২ শতাংশে নামিয়ে আনা।

১০। ইলেকট্রনিক্স ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সহ নব প্রজন্মের বিভিন্ন প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান পূর্বক দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত করা ।

১১। পরিকল্পনাকালে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে তোলা ।

১২। গ্রামীণ আর্থ - সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং উৎপাদনমুখী করা ।

১৩। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী - পুরুষের ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা ।

১৪। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১ – ২০১৫)

"ভিশন ২০২১" এবং এর সাথে সম্পৃক্ত "পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (FY10 - FY21)" এর মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং মানবিক বঞ্চনা নিরসনের জন্য বিস্তৃত পদ্ধতি অবলম্বন করে। সুনির্দিষ্ট কৌশল এবং বাস্তবায়নের জন্য যে দুটি

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১ - ২০১৫) যা জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়।

ক. পরিকল্পনার আয়তন

পরিকল্পনা দলিলটি বাস্তবায়ন করতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে প্রায় ১৩ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ তিন লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা। আর মোট বিনিয়োগের ৭৭ শতাংশ বা ১০ লাখ ৩৯ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা আসবে ব্যক্তি খাত অর্থাৎ বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে। পরিকল্পনায় বিদেশি উৎস থেকে অর্থায়ন ধরা হয়েছে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ, যার ৪ শতাংশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হিশেবে আসবে বলে আশা করছে সরকার।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র হ্রাসের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ , যা দুটি সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণের মাধ্যমে অর্জন করা হবে ।

১। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি ।

২। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বন্টন ব্যবস্থার ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ ।

৩। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এই কৌশলের মূল উপাদান ।

৪। কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈচিত্য আনয়ন ও এই খাতের বাণিজ্যিকরণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং যারা কৃষিখাতে থাকবে , তাদের উচ্চ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে ।

৫। এই পরিকল্পনায় দেশজ বিনিয়োগ কর্মসূচি (সিআইপি) বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

৬। এই পরিকল্পনায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ সুসমন্বিত করা হয়েছে ।

৭। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে ।

৮। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা হবে এবং একই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করা হবে ।

৯। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কৌশলগত একটি উপাদান হচ্ছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা , যাতে করে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িত হতে পারে । পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহের নারীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হবে ।

১০। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পদ্ধতিগতভাবে জলবায়ু সহনশীল দক্ষতা উন্নয়ন করা হবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করা হবে ।

১১। সীমিত ভূমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ।

১২। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তথ্য ও যাোগাযাোগ প্রযুক্তি (আইটি) খাতের উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।

গ. পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো মধ্যে রয়েছে :

১. একটি ধর্মনিরপেক্ষ সহনশীল উদার প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ;

২। সুশাসন বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাস ;

৩। টেকসই মানবউন্নয়ন ;

৪। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস ;

৫। একটি দূরদর্শী সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি কাঠামো প্রতিষ্ঠা ; ৬। সহায়ক শিল্প ও বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থার উন্নয়ন ;

৭। বৈশ্বিক করণ ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বা বাধাগুলো মোকাবিলা করা ;

৮। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ;
৯। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ;
১০। পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা সহজলভ্য করা ;
১১। পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ ;
১২। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ।

ঘ. পরিকল্পনার কয়েকটি উন্নয়ন কৌশল

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি উন্নয়ন কৌশল নিচে উপস্থাপন করা হলো : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা : দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য হ্রাসের একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হলো উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন , যার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য টেকসই উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয় । উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর উপায় । এই জন্য শ্রমবাজারের চাহিদা মোতাবেক কৌশল ও পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সরবরাহের দিক থেকে কর্ম কৌশল ও নীতিমালা থাকা প্রয়োজন রয়েছে । প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগের হার বর্তমানে জিডিপির ২৪.৪ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে । বিদেশে কর্মসংস্থান এবং রেমিট্যান্স বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে ।

- **তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে উপাদানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা**

ম্যানুফ্যাকচারিং , কৃষি ও পরিবেশ সহ উৎপাদনের সব ক্ষেত্রে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জোরালো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা । এ ক্ষেত্রে সহায়ক নীতিমালার মধ্যে যথাযথ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইটি) ব্যবহারের বিষয়টি রয়েছে । প্রেক্ষিত পরিকল্পনার একটি মূল ভাবনা হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন যেখানে আইসিটি নীতিমালার রূপকল্প ও মূলনীতি গুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়েছে ।

- **জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করা**

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করার ব্যাপারে গভীর মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে । জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করার ব্যাপারে অতীতে অগ্রগতি অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ । এ অবস্থায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা আগে কমিয়ে আনার ব্যাপারে নতুন করে জোর প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কৌশল মেয়েদের শিক্ষা , নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য , সরকারি - বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেবা এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।

- **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ**

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সামর্থ্য রাখে । সঠিক ভাবে উৎসাহিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ থেকে খাদ্য রপ্তানির সুযোগ রয়েছে । এ জন্য কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে । খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি খাতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল কে কাজে লাগানোর বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । জাতীয় খাদ্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনা এবং দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১০-১৫ এর সহায়তা নিয়ে খাদ্য নিরাপত্তার ত্রৈমাত্রিক বিষয় সহজলভ্যতা , প্রবেশাধিকার ও উপযুক্ত ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হবে ।

ঙ. পরিকল্পনার খাত অনুযায়ী বন্টন এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী বন্টন এর সারসংক্ষেপ : ১। পরিকল্পনার মেয়াদ , পাঁচ বছর (২০১-১১ থেকে ২০১৪-১৫) ;

২। মোট বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা) - ১৩,৪৬৯.৪;
৩। সরকারি খাতে বিনিয়াোগ (বিলিয়ন টাকা) -৩,০৭৫.৮ ;
৪। বেসরকারি খাতে বিনিয়াোগ (বিলিয়ন টাকা) -১০,৩৯৩.৬ ;
৫।দেশজ উৎস (মাোট) (বিলিয়ন টাকা) - ১২,২১৫.৩ ;
৬। দেশজ উৎসের অংশ (%) - ৯০.৭ ;
৭। বিদেশি উৎস (নিট) - ১,২৫৪.১ ;
৮। বিদেশি উৎসের অংশ (%) - ৯.৩ ;
৯। দেশজ সম্পদ বেসরকারি খাত (বিলিয়ন টাকা) - ৯,৯৭৫ ;
১০। বৈদেশিক সম্পদ সরকারি খাতে (বিলিয়ন টাকা) - ৮৩৬.২ ;
১১। বৈদেশিক সম্পদ বেসরকারি খাত (বিলিয়ন টাকা) - ৮১৭.৯ ;

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫ – ২০২০)

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলে ২০১৫ সালের ২০ অক্টোবর দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫/১৬-২০১৯/২০) অনুমোদন করা হয়।

ক. পরিকল্পনার আয়তন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জন্য (২০১৬-২০ সাল পর্যন্ত) ব্যয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৩১ লাখ ৯০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা । যা এ যাবতকালের সর্বোচ্চ ব্যয়ের লক্ষ্য । মাোট ব্যয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আয় ধরা হয়েছে ২৮ লাখ ৪৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ৩ লাখ ৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা । আগামী ৫ বছরে মাোট যে ব্যয়ের (বিনিয়াোগ) লক্ষ্য ধরা হয়েছে তার মধ্যে সরকারি ব্যয় ৭ লাখ ২৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাত (বৈদেশিকসহ) থেকে ২৪ লাখ ৬৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা । সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ২০১৬ সালের মূল্যমাত্রায় সর্বমোট ৩১৯০২.৮ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। এর মধ্যে গণক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে ৭২৫২.৩ বিলিয়ন এবং ব্যক্তি খাতে হবে ২৪৬৫০.৫ বিলিয়ন টাকা। ব্যক্তি খাতে এই বিনিয়োগ সার্বিক বিনিয়োগের ৭৭%-এরও বেশি। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এই বিনিয়োগের জন্য আহরণ করা হবে ২৮৮৫১ বিলিয়ন টাকা (৯০.৪%) এবং বিদেশী উৎস থেকে সহায়তা হিসেবে আসবে প্রায় ৩০৫২ বিলিয়ন টাকা (৯.৬%)।

খ. পরিকল্পনা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজির একত্রিত উদ্দেশ্যসমূহ ছিল–

১। বাণিজ্য এবং বেসরকারী খাতের উন্নয়নের দ্বারা সমর্থিত প্রবৃদ্ধিকে প্রসারিত করার জন্য সহায়ক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা।
২। সকল শ্রেণীর এবং অঞ্চলের দারিদ্র্য এবং বৈষম্য হ্রাস করা।
৩। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
৪। দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
৫। স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘস্থায়ী প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ। এর পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণ।
৬। সবার জন্য নিরাপদ পানীয় জলের সহজলভ্যতা এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণ।
৭। উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নত করা।
৮। শক্তি, খনিজ সম্পদ উৎপাদন, খরচ এবং ব্যবহারে টেকসইকরণ নিশ্চিতকরণ।
৯। লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।

১০। পরিবেশ অবক্ষয় থেকে রক্ষা এবং প্রতিরোধ করা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
১১। টেলিফোন এবং ব্রডব্যান্ড পরিষেবাদির মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
১২। নগর দারিদ্র্য হ্রাস এবং উন্নত নগর প্রশাসনের মাধ্যমে এবং পরিষেবার উন্নতির মাধ্যমে জীবনযাত্রার বৃদ্ধি করা।
১৩। অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচার এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।
১৪। টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব জোরদার করা।

গ. পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ৬.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে অতিক্রম করে বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ৭.৪ শতাংশে উন্নীত করা। পরবর্তী দুটি অর্থ বছরে এই লক্ষ্য অর্জন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে অগ্রগতি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে–
১। ২০১৭৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৭.৮৬ শতাংশে পৌঁছেছে, যখন গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের।
২। পরিষেবা খাতের একটি ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে।
৩। সরকারী বিনিয়োগ বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ করছে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক অনেকাংশেই এগিয়ে গিয়েছে।
৪। এই সময়ের অন্যতম বড় সাফল্য হলো মুদ্রাস্ফীতির হার ৬.০ শতাংশের নিচে সীমিতকরণ।
৫। টিভিইটি (কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (১৪ শতাংশ), তবে এখনও মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।
৬। বয়স্কদের মধ্যে ১৫+ বছর বয়সীদের সাক্ষরতার হার ৬৬.৯% এর বিপরীতে ৭৩.৯ শতাংশে পৌঁছেছে।
৭। পাঁচ বছরের কম বয়সী মৃত্যুর হার (প্রতি এক হাজার জীবিত জন্ম) এবং শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি এক হাজার জীবিত জন্ম) এর উন্নতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যা ২০১৯ সালে যথাক্রমে ৪৩ এবং ৩২ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২৯ এবং ২২ এ নেমে গেছে।
৮। জন্মের সময় আয়ু, মোট (বছর) বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ২০১৮ সালে ৭২.৩ এ পৌঁছেছে।
৯। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করছে, যা ২০১৬ সালের ৭৬ শতাংশের তুলনায় ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬.৮ শতাংশ হয়েছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০ – ২০২৫)

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে রাজধানীর শেরেবাংলানগর এনইসি সভাকক্ষে একনেক চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫) চূড়ান্ত মুদ্রিত সংস্করণটির মোড়ক উন্মোচন করেন। দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

ক. পরিকল্পনার আয়তন ও অর্থসংস্থান

৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন) চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে মোট ৬৪ হাজার ৯৫৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসবে ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং বিদেশি উৎস থেকে আসবে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ। মোট বিনিয়োগের মধ্যে সরকারি খাত থেকে আসবে ১২

হাজার ৩০১ দশমিক ২ বিলিয়ন টাকা, যার আকার ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। আর বেসরকারি খাত থেকে আসবে ৫২ হাজার ৬৫৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন টাকা, যার আকার ৮১ দশমিক ১ শতাংশ।

খ. পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

১. অষ্টম (২০২১-২০২৫) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হবে। এর মধ্যে ৩৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রবাসে বাকি ৮১ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে দেশে।
পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।তবে কর্মসংস্থানের এই লক্ষ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় ১০ লাখ কম। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনেক লক্ষই পূরণ হয়নি। যেটা অষ্টম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে।
২. এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো থেকে বিদেশে কর্মী পাঠানোর সুযোগ তৈরির লক্ষে সঠিক তথ্য, প্রশিক্ষণ, অভিবাসন ব্যয় মেটাতে ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে।প্রতিবছর নিদিষ্ট সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার।
৩. গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল ৮ দশমিক ২০ শতাংশ।কিন্তু কোভিড-১৯ এর ধাক্কায় সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবশেষ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ ধরা ধরা ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ।
৪. চলতি অর্থবছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতির লক্ষ ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। যা ধাপে ধাপে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি নেমে আসবে ৫ এর নিচে, নিদিষ্ট করে ৪ দশমিক ৮ শতাংশে।এই লক্ষ্যে কাজ করবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।
৫. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে দারিদ্র সমস্যা মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব জেলাগুলোতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
৬. দ্রুত দারিদ্র হ্রাসকরণে জোর দেওয়া হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। এক্ষেত্রে দারিদ্র হার ১৫.৬% নামানোর লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে।
৭. উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেওয়ার লক্ষে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক কৌশল নেওয়া হয়েছে। ২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হবে নতুন পরিকল্পনায়।
৮. এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা কৌশল হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য পথপরিক্রমা প্রণয়ন, যা হবে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ও টেকসই পরিকল্পনগ্রহণ।
৯. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে বিনিয়োগের লক্ষ্য ধরা হচ্ছে মোট জিডিপির ৩৭ দশমিক ৪০ শতাংশ।

দারিদ্র্যবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় গুণগত শিক্ষা, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্বসহ বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
এছাড়া শ্রমবাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করা, আয়-বৈষম্য কমানো, সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, টেকসই নগরায়ন, সরকারের আমার গ্রাম আমার শহর প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

লেখকঃ ইন্টার্ন, ওয়াইপিএফ কন্টেন্ট এন্ড এডিটোরিয়াল (বাংলা)।

সূত্রঃ

[তথ্যসূত্র-১]

[তথ্যসূত্র--২]

[তথ্যসূত্র-৩]

[তথ্যসূত্র-৩]

[তথ্যসূত্র-৪]

[তথ্যসূত্র-৫]

[তথ্যসূত্র-৬]